বিভূতিভূষণের গল্প-ভাষা

সুমিতা চক্রবর্তী

কথাশিল্পীর শিল্প-মাধ্যম ভাষা হওয়াতে ভাষার প্রতি উদাসীন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। বিশিষ্ট লেখকেরা এমনভাবে নিজেদের বাক্ শিল্পরীতির সঙ্গে অন্বিত হয়ে যান যে তাঁদের ভাষা অভিধা-চিহ্নিত হয়ে যায় তাঁদেরই নামে। বঙ্কিমি ভাষা, রাবীন্দ্রিক ভাষা, প্রমথ চৌধুরী বা কমলকুমার মজুমদারের ভাষা — প্রসঙ্গ উঠলেই সাহিত্য-পাঠকের মনে নির্দিষ্ট গুণাঙ্কিত হয়ে ভেসে ওঠে। এই লেখকদের ভাষায় নিজস্বতা-ব্যঞ্জক এক ধরনের অলংকরণ আছে। সে অলংকার বহিরঙ্গিকতা-মাত্র নয়। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পরূপের অভিপ্রায় অনুসারেই তা নির্মিত। তবু এই লেখকদের লিখিত যে-কোনো গদ্যাংশের উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে 'সরলতর' গদ্যে প্রকাশ করা সম্ভব। তাতে শিল্পরূপটি তার ব্যঞ্জনা হারাবে নিশ্চিতভাবেই, কিন্তু বলবার বিষয়টির সংবাহন ঠিকই থাকবে — হয়তো বা বাড়বে কখনো কখনো। ধরা যাক সমাজ-জীবনের সত্যিকারের চন্দরা-কে শোনানো হল রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পটি। গল্পাংশের মর্মবস্তু অচিরাৎ বিদ্ধ করবে তাকে কিন্তু গল্পটির বহু অনুচ্ছেদ তার কাছে হয়ে থাকবে নিরর্থক। ভাষার ধরনটিই তার কারণ, ভাষা-নিহিত অনুভবলোকটি নয়। কমলকুমার মজুমদারের একাধিক গল্পের নায়ক নায়িকা সম্পর্কেও বলা চলে একই কথা।

শরৎচন্দ্রের ভাষা সম্পর্কে কথাটি ততটা খাটে না। সারল্যই তাঁর কথাসাহিত্য-ভাষার প্রধান অলংকরণ — অর্থাৎ নিরলংকৃত বাক্। সেই ভাষারূপ নির্মাণেও যত্ন-কৃতির কোনো অভাব থাকে না; থাকে নিয়ত-সচেতনতা ও বহুল চিন্তন। কিন্তু সবিশেষ শিল্পমনস্ক, সুশিক্ষিত পাঠকের জন্য নয়, সর্বশ্রেণির সাধারণ পাঠকের কথা ভেবেই সেই ভাষার রূপাবয়ব গড়ে তোলেন শরৎচন্দ্রের মতো লেখকেরা। কেবল সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ও অল্পসংখ্যক তৎসম শব্দের বাধা পার হলেই শরৎচন্দ্রের গল্প — শ্রবণে ও পঠনে (সম্ভব হলে) গফুর এবং কাঙালীচরণেরও বুঝতে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। ভাষার বিন্যাসটিই সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মাপে পরিকল্পিত। প্রতিভার মহত্ত্ব তাঁর এখানেই — ভাষা-বিশ্লেষক সমালোচকও প্রতি পদেই সেই বিন্যাস-অঙ্গে মুগ্ধতার উপকরণ খুঁজে পান। একটি লোকায়ত ছড়া ও প্রবাদ যেমন নির্মিতি নৈপুণ্যে আমাদের অপার-বিস্মিত করে রাখে আজও।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র পরবর্তী লেখকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই ঘরানার সবচেয়ে কাছাকাছি। ভাষা প্রয়োগে তিনি সচেতন ও যত্নশীল। কিন্তু কথাবস্তু সংবাহনের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই নিবদ্ধ সেই যত্ন। শিল্পরূপের মর্মকথাটির অবাধ-ব্যঞ্জনা সঞ্চারেই তিনি আগ্রহী। বক্রোক্তির জায়গায় সরলোক্তিই তাঁর প্রিয়তম আয়ুধ।

ভাষা সম্পর্কে বিভূতিভূষণের শ্রুতি ও চেতনা সজাগ ছিল তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তাঁর গল্পগুলির মধ্যেই। তাঁর গল্পে সাধারণত গল্প-কথকের দুটি ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এক ভূমিকায় তিনি সর্বজ্ঞ লেখক। গল্পের চরিত্র ও ঘটনার বিবরণ তিনি দিয়ে যান। কিন্তু নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন

না। পাঠকের সামনে একটি আখ্যান ও কয়েকটি মানুষের রূপ তিনি গড়ে তুলছেন — এই পরিমণ্ডলটি অক্ষুণ্ণ থাকে প্রায় সবসময়েই। ফলে গল্প-ভাষায় দুটি সমান্তরাল মানস-সম্পর্ক থাকে বহমান। একটি হল — গল্পে বিন্যস্ত নরনারীর পারস্পরিক হৃদয়-সংযোগ ও ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্ক; অপরটি হল পাঠক ও লেখকের মধ্যে একটি ভাব-বিনিময়ের যোগ। স্বভাবতই তা অতিস্পষ্ট নয়। লেখকের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলে তা শিল্পরূপের কিছু হানি ঘটায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের গল্পে তা একেবারে প্রচ্ছন্নও নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রীতিতে পাঠক-সম্বোধন অবশ্য তিনি করেননি; তবু পাঠকদের দিকে তাকিয়ে কথা বলেছেন তা স্পষ্টই বোঝা যায়। যে-সব গল্পে লেখকের ভূমিকা সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে মিলে যায়নি সেখানে গল্প-কথক গল্পেরই এক চরিত্র। কিন্তু পার্থক্য কি সেখানেও খুব বেশি? গল্প-কথক 'আমি' বিভূতিভূষণের গল্পে প্রায় সর্বত্রই গ্রামবাসী কিন্তু কৃষক নয়, সে মধ্যশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত — কোথাও দোকানে বা আড়তে বা কোনো সওদাগরি অফিসে চাকুরিরত; অথবা স্কুল-শিক্ষক; প্রায়শই তার লেখালেখির কিছু অভ্যাস আছে। এই গল্প-চরিত্র আর বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্ব প্রায় সর্বত্রই সমমানসিকতাসম্পন্ন।

বিভূতিভূষণ তাঁর পাঠকদেরও সেই একই সামাজিক শ্রেণিভুক্ত ও মানসিকতাসম্পন্ন বলে জানেন। এই জ্ঞান তাঁর গল্প-ভাষাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে।

ভাষা-শিল্পের ক্ষেত্রে লেখকের ভাষার গড়ন অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন এক. লেখকের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, রুচি ও সামাজিক শ্রেণি। দুই. তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠককুলের শিক্ষা, সম্ভাব্য রুচি ও সামাজিক শ্রেণি। এই দ্বিতীয় বিষয়টি বেশ জরুরি এবং মনে হয়, গল্পভাষার মান-নির্ণয়ের প্রধান দিশারি। একালের লেখক একটি আঞ্চলিক শব্দের পাশে বন্ধনীতে বলে দেন শব্দের অর্থ। তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় যে, তিনি শহুরে মধ্যবিত্ত পাঠকদের লক্ষ করে ভাষা-নির্মাণ করেছেন। তিন. লেখকের গৃহীত বিষয় অনুসারেও ভাষায় শব্দ, প্রবাদ প্রবচন, বিন্যাস-ভঙ্গি ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। চার. লেখকের উদ্দেশ্য অনুসারেও ভাষায় আসে ভিন্নতা। পাঁচ. সাহিত্যের যে রূপবন্ধটি ব্যবহার করা হচ্ছে — তা-ও অনেক সময়ে ভাষায় কিছু বিশিষ্টতা সঞ্চার করতে পারে। যেমন, দেখা যায় গল্প-ভাষায় অতীত কালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বেশি — বলল, করল ইত্যাদি। কবিতায় মুখ্যত ব্যবহৃত হয় নিত্য বর্তমানের ক্রিয়াপদ — যায়, দোলে ইত্যাদি। বিভূতিভূষণের গল্প-ভাষার নির্মাণেও দৃষ্ট হয় এই প্রতিটি সূত্রের সংমিশ্রণ।

বিভূতিভূষণের গল্প-নির্মাণ জনিত ভাষা-সচেতনতা বিশেষভাবে সাধারণ শিক্ষিত, বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠকের উদ্দেশে এক ধরনের অভিমুখীনতার অনুসারী। সেই ভাষার গড়ন একজন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে আর একজন বাঙালি ভদ্রলোকের বাক্-বিনিময়ের অনুরূপ। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক।

ক. নিস্তারিণীর স্বামী হরি যুগীর গ্রামের উত্তর মাঠে কলাবাগান ছিল বড়। কাঁচকলা ও পাকাকলা হাটে বিক্রি করে কিছু জমিয়ে নিয়ে ছোট একটা মনোহারী জিনিসের ব্যবসা করে। রেশমি চুড়ি ছ'গাছা এক পয়সা, দু'হাত কার এক পয়সা — ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে মনে হ'ল, 'কার' মানে ফিতে বটে, কিন্তু 'কার' কি ভাষা? ইংরিজিতে এমন কোনো শব্দ

নেই, হিন্দি বা উর্দুতে নেই, অথচ 'কার' কথাটা ইংরিজি শব্দ বলে আমরা সকলেই ধরে নিয়ে থাকি। যাক্ সে ...

(মুক্তি)

এই অংশের 'প্রসঙ্গক্রমে' থেকে শুরু করে 'যাক্ সে' পর্যন্ত অংশটি কার উদ্দেশে রচিত? নিস্তারিণী বা হরি যুগীকে জানবার জন্য এই অংশটির কোনো প্রয়োজন পড়ে না। শব্দ-উৎস সন্ধানে আগ্রহী লেখক এখানে শিক্ষিত পাঠকদের জন্যই বাক্যগুলি লিখেছেন। গল্পের পরিসরে এই বাক্যগুলি বস্তুতই বাহুল্য। শব্দতত্ত্ব-ঘটিত এই ভাব-বিনিময় ঘটেছে নিতান্তই লেখকের ও পাঠকের মধ্যে। গল্পটির শিল্পরূপ ব্যঞ্জনায় কোনো সাহায্য তো করেইনি, খানিকটা বোধহয় দুর্বলই করেছে এই অংশটিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কার' শব্দটি ইংরেজি কর্ড (cord) শব্দের তদ্ভব রূপ।

খ. দ্রব ঠাকরুণ ভালো বুঝতে না পেরে বল্লেন — কি বল্লেন?

দ্রব ঠাকরুণের 'বল্লেন' এই কথায় 'ব'-এর উচ্চারণ যশোর জেলার উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী প্রসারিত উচ্চারণ, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার উচ্চারণে এই সব স্থানের উচ্চারণ যতদূর সম্ভব আকুঞ্চিত। 'বল্লেন'-এর উচ্চারণ 'বোল্লেন' — 'ও' কার-এর উচ্চারণও যতদূর সম্ভব ঘোরালো।

— বোলচি, লোমবস্ত্র বের করে পরুন, একটু কিছু মুখে দিতে হবে তো?

(দ্রবময়ীর কাশীবাস)

ধ্বনির উচ্চারণের পার্থক্যে দুই বৃদ্ধার দেশ, জীবনযাপন ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্য চমৎকার ধরিয়ে দিয়েছেন লেখক। ধরিয়ে দেওয়া পাঠকদেরই জন্য তবু এই অংশের উচ্চারণ বিষয়ক মৃদু গবেষণাটি আগের উদাহরণের মতো অপ্রাসঙ্গিক নয়। গল্পের চরিত্র পরিস্ফুটনের কাজে লেগেছে যথাযথ। দক্ষিণ-দেশীয়া, কাশীবাসিনী, মধ্যবিত্ত এবং ঈষৎ নাগরিক পরিমার্জনা সম্পন্ন প্রৌঢ়ার মুখের 'লোমবস্ত্র' শব্দটির অর্থ গ্রামবাসী দ্রবঠাকরুণ বুঝতেই পারেননি। শব্দটির সাহায্যে দুই বৃদ্ধার অসম মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে এইভাবেই।

গ. পুঁটিদের বাড়িতে চারটা বড় বড় ধানের আউড়ি আছে, গোলা আছে একটা। আউড়ি জিনিসটা গোলার চেয়ে অনেক ছোট, তিন-চার বিশ ধান ধরে — আর একটা গোলায় ধরে এক পৌটি অর্থাৎ ষোলো বিশ ধান।

(গায়ে হলুদ)

'আউড়ি' এবং 'পৌটি' শব্দের ব্যাখ্যা নির্ভুলভাবে শহরবাসী পাঠকের মুখের দিকে তাকিয়ে করেছেন বিভূতিভূষণ। এইসব অংশে তাঁর উদ্দিষ্ট ভাষারীতি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেখানে এতটা দাগানো নেই সেখানেও ওই একই উদ্দেশ্য বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের বৃহত্তম অংশটির কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য আপন ও সুবোধ্য ভাষাটি গল্প-নির্মাণে সর্বদাই ব্যবহার করবার দিকে বেশ দৃষ্টি ছিল তাঁর। অনেকটা একারণেই জটিলতাহীন, স্বাদু-সরল, অ-তীক্ষ্ণ গল্প লিখেও বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়েছেন ও এখনও জনপ্রিয় থেকে গেছেন বিভূতিভূষণ।

কখনো কখনো এই প্রবণতা তাঁর গল্পভাষাকে সামান্য দুর্বলও করেছে। গ্রামীণ শব্দাবলি প্রয়োগের সময়ে কটু, কুৎসিত, গালিগালাজ বা 'মুখ খারাপ করা'-র নিদর্শন তাঁর গল্পে একেবারেই

নেই। প্রথমত তিনি এমন পরিস্থিতিই প্রায়শ নির্মাণ করেন না যেখানে কটুকথার বিনিময় ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত, যখন তেমন সম্ভাবনা দেখাও দেয় তখনও ভাষার ক্ষেত্রে শোভনতা তথা নীতিবোধশীলিত এক ধরনের রুচি তিনি ছাড়তে পারেন না। খুব সফলভাবে না পারলেও কল্লোল-পর্বের শৈলজানন্দ ও মনীশ ঘটক তাঁদের কথাসাহিত্যের ভাষায় ওই নৈতিকতার আড়াল কিছুটা সরাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের তেমন চেষ্টা ছিল না। বরং সেই আড়ালটি রাখবারই চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ফলে তাঁর গল্পের ভাষায় মাঝে মাঝে এমন শব্দ এসেছে যা বিষয়টিকে পরিস্ফুট করবার পক্ষে যথার্থ নয়। উদাহরণ —

ক. তুলসী দারোগা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জাঁহাবাজ দারোগা — 'হয়'-কে 'নয়' করবার এমন ওস্তাদ আর ছিল না। চরিত্র হিসেবেও যে নিষ্কলঙ্ক ছিল, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। তুলসী দারোগার নামে এ অঞ্চলে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। তার সুনজরে একবার যিনি পড়বেন, তাঁর হঠাৎ উদ্ধারের উপায় ছিল না। এ হেন তুলসী দারোগা হঠাৎ উন্মনা হয়ে পড়লো সুন্দরী গ্রাম্যবধূকে নির্জন নদীতীরের পথে দেখে।

(মুক্তি)

এই অংশে 'উন্মনা' শব্দটির অর্থ আদৌ উন্মনা নয়। 'কামার্ত', 'লোভার্ত' বা 'লুব্ধ' বলতেই চেয়েছেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু বলতে পারেননি। তুলসী দারোগার প্রতি সম্মানবশত নয়; গ্রাম্যবধূটির প্রতি শ্রদ্ধাবশতই এই বাক্‌সংযম। 'কামার্ত' শব্দের প্রয়োগে এক শ্রদ্ধাযোগ্য নারীর দেহরূপে যেন গ্লানির স্পর্শ লাগবে — এমন মনে হয়েছিল তাঁর। সেই বোধের আভাসও পাঠকের চিত্তে যাতে না জাগে সেই চেষ্টায় সজাগ ছিলেন তিনি। রুচিগত নৈতিকতা ছাড়া আর কীই বা বলা যাবে এই শব্দ প্রয়োগকে!

খ. মহকুমা শহরে একটা পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গিয়াছি, ফিরিবার পথে একটা গলির মধ্যে দিয়া বাজারে আসিয়া উঠিব ভাবিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় কে ডাকিল — ও জ্যাঠামশায়!

... কাছে গিয়া বলিলাম — কে?

— বা-রে, চিনতে পারলেন না? আমি হাজু।

হাজু বলিলেও আমার মনে পড়িল না কিছু। বলিলাম — কে হাজু?

সে হাসিয়া বলিল — আপনাদের গাঁয়ের। বা-রে, ভুলে গেলেন? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।

(বিপদ)

এই শেষ বাক্যটির 'নটী' শব্দটি এই পরিস্থিতিতে একেবারেই যথার্থ প্রয়োগ নয়। হাজু নামের নিঃস্ব গ্রামবালিকাটি শহরে যে-স্তরের দেহজীবিনী তাদের নটী বলে না কেউ। তারা নিজেরা তো বলেই না। যা বলে সে-জাতীর শব্দ গ্রাম-সুবাদে জ্যাঠামশায়ের কাছে উচ্চারণ করা চলে না। আকারে, ইঙ্গিতে বোঝানোই সংগত। কিন্তু ভাষার মধ্যে ততটা আকার ইঙ্গিত ফুটিয়ে তোলার

কারিগরি নিয়ে ভাবিত হননি বিভূতিভূষণ। এই আত্মপরিচয় দানের ভাষা অসংগত জেনেও তা প্রয়োগ করেছেন তিনি। কারণ মেয়েটির ভাব-ভঙ্গির বর্ণনায় কালক্ষেপ করবার কোনো ইচ্ছেই নেই তাঁর। এই পরিচয়-পর্ব তিনি দ্রুত সেরে ফেলতে চান। যতটা সম্ভব শোভন শব্দটি প্রয়োগ করে কাজ মিটিয়েছেন তিনি — 'নটী'। একদিক থেকে তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক। কিন্তু 'নটী' শব্দটি একটু বেশিরকম পরিশীলিত হয়ে গেছে, স্বাভাবিক আবহটিকে একটু ক্ষুণ্ণ করেছে — একথাও অস্বীকার করা চলে না।

বিভূতিভূষণের গল্পে সামাজিক শ্রেণির মধ্যবিত্ত স্তরের বাঙালি ভদ্রলোকের অভ্যস্ত ভাষা-ভঙ্গির এই প্রয়োগ ক্বচিৎ কখনো অত্যন্ত সুনিপুণ হয়েও দেখা দিয়েছে। যেমন 'ভিড়' গল্পে প্রবল ভিড়ের চাপে বিপর্যস্ত হয়ে, ট্রেন ধরতে পারবে কিনা সেই দুশ্চিন্তা নিয়ে টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়েছে গল্পের নায়ক। এ গল্পে সে-ই কথক — লেখকের প্রতিনিধি।

গ. কনুইয়ের কাছে একটি সানুনয় অনুরোধ — আমায় বাবু একখানা মেচেদার টিকিস যদি ক'রে দেন, ছোট ছেলে সঙ্গে রয়েছে, ভিড়ে ঢুকতে পারছি না, দু'বার গেনু —
মাথা তখন সম্পূর্ণ বেঠিক। বলি, — ভাগো।
— বাবু, দেন একখানা। দু'বার গেনু —
— নেই হোগা, ভাগো।
রাগের মাথায় হিন্দি বেরিয়ে পড়ে।

(ভিড়)

এই ভাষা প্রয়োগে লেখক সমগ্র বাঙালি জাতির আত্মাভিমানী মুখোশটিকে খুলে দিয়েছেন। বাঙালি বহুকাল থেকে ধরে নিয়েছে যে তারাই 'ভদ্রলোক', আর খেটে খাওয়া দরিদ্র শ্রেণি — কুলি মজুরের দল — তারা হিন্দিভাষী প্রদেশ থেকে আগত। বস্তুত, আজও দেখা যায় — বাঙালি সম্পূর্ণ অকারণে স্টেশনের চা-বিক্রেতা, রেস্তোরাঁর পরিচারকের সঙ্গে হিন্দি ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করে। অনেক সময়েই তারা বাঙালি, আর অ-বাঙালি হলেও বাংলা বোঝে বাঙালির মতোই। এই চেষ্টার মূলে আছে জাতিগত অহংকার — ও-কাজ বাঙালিদের নয়! এই বাঙালিই তার বাড়ির পোষা কুকুরটির সঙ্গে ইংরেজি বলে — একথা পরিহাস হিসেবে জীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু মিথ্যা হয়ে যায়নি। ঠিক এই কথাটিই বিভূতিভূষণ বুঝিয়ে দিয়েছেন এই অংশের হিন্দি ভাষার প্রয়োগে। মেচেদাবাসী, নিরীহ, দরিদ্র ও গ্রামীণ বঙ্গ-সন্তানকে উপেক্ষার তিরস্কার করবার সময়ে শিক্ষিত বাঙালির 'হিন্দি বেরিয়ে পড়ে' বলবার সময়ে লেখক একই কটাক্ষে বিদ্ধ করেছেন নিজেকে ও তাঁর পাঠকদের।

কথাসাহিত্যের ভাষাকে বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষা — এই দুটি নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যায়। গল্প যদি নায়কের জবানিতেও উপস্থিত হয়, সেখানেও সাধারণত থাকে একাধিক চরিত্র। চরিত্রগুলিকে স্বরূপে প্রস্ফুট করে তোলবার পক্ষে অন্যতম প্রকরণ হল সংলাপ। সংলাপের ভাষা থেকেই বোঝা যায় লেখক তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলিকে কতটা চেনেন, কতটা তিনি যেতে পেরেছেন তাদের কাছাকাছি। শিল্পরূপের দিক থেকে সব গল্পই একই জাতের নয়। তবে, আজও বাস্তবের বিবৃতির ওপর দাঁড়ানো গল্পই রচিত হয় বেশি। বিভূতিভূষণের গল্পও বিবৃতি-নির্ভর। বাস্তবের

আবহ-নির্মাণ এ জাতীয় গল্পের একটি শর্ত। বিভূতিভূষণ তার অন্যথা করবার কথা একবারও ভাবেননি। যখন তিনি কিছু কিছু অ-লৌকিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন সেখানেও অত্যন্ত সাধারণ সংসারী মানুষের যে অলৌকিকে বিশ্বাসের রূপ আমরা দেখি — তারই ছবি এঁকেছেন। আর চন্দ্রগুপ্তের কালের গল্প লেখবার সময়েও সেকালের বাস্তবতাকেই অটুট রাখতে চেষ্টা করেছেন যতটা সম্ভব। ফলত বিভূতিভূষণের সংলাপের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার বাস্তবতায়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, কাটোয়া ইত্যাদি অঞ্চলের আঞ্চলিক মুখের ভাষাকে রূপায়িত করেছেন বিভূতিভূষণ প্রায় যথাযথ। গ্রামীণ কৃষক, দিন-শ্রমিক, ছোটো ব্যবসায়ী, গ্রামীণ নিম্নবিত্ত ভদ্রজন, খেটে খাওয়া মানুষদের খুব কাছাকাছি ছিলেন তিনি; ভালোবেসেছিলেন সেইসব মানুষদের। তাঁর অনেক গল্পের বলবার কথাটিই হল এই মানুষদের তুলে ধরা। তাদের নিবিড় মৃত্তিকা-লগ্নতা; তাদের ভালোত্ব; কঠিন দারিদ্র, অশিক্ষা, সামাজিক উপেক্ষার মধ্যে তাদের ব্যাকুল বেঁচে থাকার নিহিত প্রাণরসের আস্বাদ দেওয়া। অনেক জীবন্ত ও স্মরণীয় চরিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। সেইসব চরিত্রের নির্মাণে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে চরিত্রগুলির সংলাপ।

লেখকের অবিমিশ্র সাফল্য গ্রামীণ নারীদের সংলাপ রচনায়। স্বাভাবিক বাচন, মেয়েলি বাগ্‌ভঙ্গি, প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ যা মেয়েদের ভাষাতেই শোনা যায় বেশি; সেইসঙ্গেই নানা ভাব ও রসের বৈচিত্র্যও সমন্বয়িত হয়েছে মেয়েদের সংলাপে। কয়েকটি উদাহরণ।

ক. দিদি, চিংড়ি মাছের খোসাগুলো একেবারে সামনেই ফেললেন, কলতলায় সকলেরই যেতে আসতে হয় — সকলেরই তো অসুবিধে। ...
— ফেলতে দেবে না তোমার কথায়? কি তুমি এমন লাট সায়েব এয়েচ রে বাপু! তুমি পাগল না আমি পাগল? রান্নাঘরের বাইরের জায়গা তোমারও যা, আমারও তা — তুমি বলতে আসবার কে?

(নদীর ধারের বাড়ি)

নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি অধ্যুষিত এক বহু ভাড়াটের বাড়িতে থাকা দুই মহিলার ব্যবহৃত বাক্যাবলীতেই সমস্ত বাড়িটির চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, এখানে, অনুভূত হয়েছে মানুষগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক —

খ. শ্যামলী বললে — তোমার নাম মুক্তোর মা?
— বলে সবাই। বলো না, অদেষ্টের মাথায় মারি সাত খ্যাংরা! নামটাই আছে বজায়, যার জন্যি সে আর নেই। তা হলি কি আজ আমার ভাবনা —

(নদীর ধারের বাড়ি)

পরিচারিকা শ্রেণির গ্রামীণ নারীর পরিচিতি তার সন্তানের নামে, তাদের কোনো নামও মনে রাখে না লোকে। অধিকাংশ সময়ে সন্তান মা-এর পরিচিতি দিলেও ভরণপোষণ দেয় না বা দিতে পারে না। তেমনই এক প্রৌঢ়া দু-তিনটি বাক্যের মধ্যে পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে। অথচ এ গল্পে সে একটি অপ্রধান পার্শ্বচরিত্র।

গ. — আর ন'বৌ। মলেই বাঁচি। নিত্যি জ্বর, নিত্যি জ্বর — ওরে মা রে, হাত-পা কি কামড়ানো কামড়াচ্চে। ... একটু উঠে-হেঁটে বেড়াতে দেবে না — এ কি কাণ্ড, হ্যাঁগা?

(দ্রবময়ীর কাশীবাস)

এক স্বল্পশিক্ষিতা গ্রামবাসিনী বৃদ্ধার কথা বলার ভঙ্গি, উচ্চারণ, স্বরগ্রাম ও সুর; অব্যয় শব্দের প্রয়োগ; বিস্ময় ও আক্ষেপের মিশ্রণসূচক অভিব্যক্তি; শব্দ বিকার — যেমন 'মলেই', 'নিত্যি' — এই সবকিছুর নিখুঁত সংমিশ্রণে এই সংলাপ ঝলমল করে ওঠে।

ঘ. — আচ্ছা, শোন্ — তারপর খোকন্‌মণি সেই পেয়ারা তো খাবেই, কিছুতেই ছাড়ে না ওর মাও দেবে না — বড্ড হেজলদাগড়া মেয়ে ওর মা, আমি বলি, বৌ, চাচ্চে খেতে, এক টুকরো ওকে দ্যাও — তা আমায় বললে — আপনি চুপ করে থাকুন, আপনি কি বোঝেন ছেলেমেয়ে মানুষ করার — ... আমি জানিনে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে — তবে তুই তোর বর পেলি কোথা থেকে রে আবাগের বেটি?

(দ্রবময়ীর কাশীবাস)

দুই প্রজন্মের নারী তাদের বিভিন্ন কথ্যভঙ্গি, আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ, প্রচলিত গালি দেবার রীতি — সবকিছু জীবন্ত এই সংলাপে। এই গল্পটির নায়িকা দ্রবময়ী বিভূতিভূষণের এক অসামান্য সৃষ্টি। বৃদ্ধা এই গ্রামবাসিনী তার স্বামীর ভিটে, মুংলি গোরু, আম-কাঁঠালের গাছ, প্রতিবেশিনী, ন'বৌ, স্বজনহীন একাকিত্ব, ম্যালেরিয়া ও পালাজ্বর নিয়ে এক অপরূপ প্রাণদীপ্তি বিকিরণ করে এসে দাঁড়ান আমাদের মনের মধ্যে। তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য তৃণজ্ঞান করে নিজের জীর্ণ কুঁড়েঘরে ফিরে এসে আ-হৃদয় স্বস্তি বোধ করা এই চমৎকার বৃদ্ধার চরিত্রটি সংলাপের ও আত্মচিন্তনের শক্তিতেই প্রত্যক্ষবৎ। বিভূতিভূষণ গ্রাম্য মেয়েলি ভাষার নির্মাণে যে অতুলনীয় কুশলতা দেখিয়েছেন তার আরও কয়েকটি উদাহরণ এই গল্প থেকে —

ঙ. আমার বড় নাতির ভাবনা কি, তার সচ্ছল অবস্থা, লুচি-পরোটা জলখাবার, তেল ঘিয়ে কলকলে করে পাঁচ ব্যান্নুন রান্না —

চ. মাগী যেন কী! কি বলে, কি করে! মাগী এমন পাষাণ যে, ছোট ছেলের বিয়েতে বাড়ী গেল না! মুখ দেখতে আছে ওর? ছিঃ —

ছ. কানুকে বল্লাম, নিয়ে চল্ ভাই গুপীনাথপুর, মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ ... কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই — এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠোনের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায় — আমাকেও তোরা ওখানে ... আঁচলের খুঁট দিয়ে দ্রব ঠাকরুণ চোখ মুছলেন।

(দ্রবময়ীর কাশীবাস)

'উঠোনের মৃত্তিকে' বাক্যাংশের তৎসম শব্দটি খুবই আকর্ষক। স্বামীর স্মরণে ভক্তি নিবেদনের উদ্দেশ্যেই মাটি-কে 'মৃত্তিকে' বলা। শুদ্ধভাষা — শাস্ত্রের ভাষা — ঠাকুরদেবতার কথা লেখা হয় যেমন ভাষায় — ভক্তিভাবের প্রকাশে সেই তৎসম শব্দ না হলে কি চলে? ভাষা-দেহের এই সূক্ষ্ম

কারুকাজগুলিও নজর করেছেন বিভূতিভূষণ। লক্ষ করেছেন কীভাবে মানবমনের নিগূঢ় নিহিত বহুবিধ অনুষঙ্গ ও সংস্কারের সঙ্গে অন্বিত থাকে প্রতিটি ব্যক্তির ভাষা।

জ. সামনের মাসে ধান ফুরিয়ে যাবে। ছত্রিশ টাকা চালের মণ, কি ক'রে এই পুরীপাল্লা চালাবো? সস্তায় নাকি কন্‌ট্রোলের ধান দিচ্চে মহকুমায় — চেষ্টা দেখো না?

(পারমিট)

এই সংলাপ যে স্বামীর প্রতি স্ত্রী-র উক্তি তা বুঝে নিতে এক মুহূর্তও লাগে না কেবল বাক্যের শব্দ-বিন্যাসের কুশলতায়।

ঝ. কি বল্‌বি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমরা কখনও গায়ে হলুদ দেখি নি, শাঁকে ফুঁ পড়লে অমনি কুকুরের মত ছুটে যাব তোমাদের বাড়ি পাতা পাততে? অত অংখার ভালো না রে পুঁটি। তোমার বাপের বড্ড ধানের গোসা হয়েচে, না?

(গায়ে হলুদ)

এই উদাহরণে গ্রাম্য কলহের অনাবরণ উচ্চগ্রাম এবং অনিবার্যভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক শ্রেণির উল্লেখ, যা শহরের মেয়েরা চেপে রাখে, তাকে প্রথম সুযোগেই সামনে এনে ফেলেছে গ্রামের মেয়েরা।

ঞ. শেষ উদাহরণটিতে যে মেয়ের সংলাপ সে 'তিনটে পাস। কলকাতার মেয়ে-ইস্কুলে কাজ করে। সোনার টুকরো মেয়ে।' সে তার দরিদ্র সৎবোনকে কলকাতায় নিয়ে যাবার সময়ে বিমাতাকে বলেছে —

ওকে গিয়েই ইস্কুলে ভর্তি করে দেবো। ... পুজোর পর তোমাকেও যেতে হবে। রান্নার ডিপার্টমেন্ট তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমরা দুই বোন লেখাপড়া নিয়ে থাকবো —

(ননীবালা)

এখানে স্কুল-শিক্ষয়িত্রী মেয়ের মুখে 'ডিপার্টমেন্ট' শব্দটির যথাযথ প্রয়োগ করতে ভুল করেননি লেখক।

অন্যান্য চরিত্রের সংলাপেও বিভূতিভূষণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে গ্রামীণ মানুষজনের ভাষা তুলে আনতেই তিনি অধিকতর সফল ছিলেন। প্রকৃত নাগরিক সপ্রতিভতা বা রুচির কৌৎসিত্য অথবা নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষের অন্তর্লোক উদ্ঘাটনে তাঁর খুব বেশি কৃতিত্ব ছিল — এমন বলা যায় না। এইসব ক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণও খুবই সীমাবদ্ধ। কয়েকটি ভিন্ন ধরনের সংলাপ-খণ্ড দেখা যাক।

ক. শহরের বাড়ির দালালের কথা —

ওদের এটর্নিরা বড্ড প্রেস করচে। কাল আপনাকে ভাবলাম একবার ফোন করি। কটার সময় সুবিধে হবে? ওর চেয়ে ভালো আর পাবেন না — তবে বায়নার আগে রেজিস্ট্রি আপিসগুলো একবার সার্চ করতে হবে।

সংলাপে ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশের ধরনটি লক্ষণীয়।

খ. গ্রামীণ মৎস্য-ব্যবসায়ী —

ডুমোর বাঁওড়ের মাছ সব যাচ্চে কলকাতায়। বিরাশি টাকা দর। এমন দর বাপের জন্মে কোনওকালে শুনি নি রায় মশায়। এক সের দেড় সের পোনা ইস্তক পড়তে পাচ্চে না। মরা গাঙে বাঁধাল দিয়েলাম — একদিন কেবল এক সাড়ে এগারো সের গজাড় মাছ — ... মাছের এমন দর, গজাড় মাছই বিক্রি হয়েল দশ আনা সের!

(গায়ে হলুদ)

মাছের ব্যাপারি-র সংলাপে মাছ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলির সুনির্দিষ্টতার মধ্যে লেখকের কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। মাছের দর আশি/পঁচাশি নয়, ঠিক বিরাশি; মাছ ধরা পড়ল সাড়ে এগারো সের; দশ/বারো সের নয় — যেমন বলে থাকি আমরা; সেই মাছ বিক্রি হল দশ আনা সের দরে। — হিসেবে কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই।

গ. তোমরা তো দিব্যি ঘুমোচ্চ, তোমাদের আর কি? গোলার ধান যাবে, সীতেনাথের যাবে। চোরের যা উপদ্রব হয়েছে তার খবর কি জানবা? মোর ওপর ঝক্কি কত! মোর তো তোমাদের মত ঘুমুলি চলবে না। সীতেনাথের এ ঝামেলা আর কদ্দিন পোয়াবো। এবার এলি চাবিছড়া তার হাতে দিয়ে মুই খোলসা হবো। এ আর পারি না বুড়ো বয়সে রাত জাগতি —

(রূপো-বাঙাল)

বাড়ির বিশ্বস্ত কৃষাণ, যে গৃহকর্তার সম্পত্তি রক্ষণে একাগ্র — বিভূতিভূষণের কালে দুর্লভ ছিল না। তেমনই একজন মানুষকে কেবল সংলাপের নৈপুণ্যেই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন বিভূতিভূষণ এ গল্পে।

তবে একথাও সত্য যে, বিচিত্র মানব-সংসারের বিচিত্রতর মানুষের সর্বশ্রেণিকেই বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে মূর্ত করে তুলতে পারেননি। পৃথিবীর কুশ্রীতার চেহারা তাঁর সৃষ্ট মানুষগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে না। তাদের স্বভাবসিদ্ধ মুখের ভাষাও আসে না তাঁর কলমে। তাঁর ছোটোগল্পে খল চরিত্র প্রায় দেখাই যায় না। দেহজীবিনীর চরিত্র তিনি মাঝে মাঝেই এনেছেন তাঁর গল্পে। সর্বত্রই তাদের আচরণ ও সংলাপ গৃহস্থ কন্যা ও বধূর মতোই প্রায়। এমন নয় যে, দেহজীবিনীর ভাষা গৃহী নারীর চেয়ে গুণগতভাবে পৃথক হবে কারণ ঘরের মেয়েরাই পরিস্থিতির চাপে পথে দাঁড়ায়। কিন্তু যে-পেশায় তারা আসে তারও একটি নিজস্ব ভাষা আছে; সুখ-দুঃখ, খাওয়া-পরা, সাজ-সজ্জা, সন্ধ্যা ও রাত্রি বিষয়ক যে-কোনো সংলাপে দেহজীবিনী নারীর মুখে যে শব্দাবলি ও অভিব্যক্তি পেশাগত ভাবেই নিতান্ত স্বাভাবিক, তা গৃহস্থের রুচিতে অশোভন। বিভূতিভূষণের গল্পে দেহজীবিনী নারীর সংলাপে কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আসেনি। প্রায় সমকালীন লেখকদের মধ্যে একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র, কিছুটা সংলাপে, কিছুটা ভাষাগত ব্যঞ্জনায় বেশ্যাপল্লির স্বাভাবিকতা অনেকখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

সংলাপের ভাষা ও বিবৃতির ভাষা — দুইই লেখকের। তবু বিবৃতির ভাষা আরও বেশি করে লেখকের নিজস্ব। সংলাপ রচনার সময়ে লেখকের উদ্দেশ্য থাকে গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

ছাড়াও, বিশিষ্ট একটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলা। ফলে উদ্দিষ্ট চরিত্রের শ্রেণি, শিক্ষা, স্বভাব অনুসারে একটি ভাষাগত কাঠামো আগেই তাঁর মনে স্থাপিত হয়ে থাকে। খানিকটা অভিজ্ঞতা ও খানিকটা গল্প-বিন্যাসের দাবি অনুসারে সেই কাঠামো নির্মিত হয়। অর্থাৎ একজন কৃষক বা মাছের ব্যাপারি-র সংলাপের স্বাভাবিকতা আসে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতার নিবিড়তা থেকে। সেই তুলনায় বিবৃতির ভাষায় লেখকের নির্মাণ-কৌশলের পরীক্ষণ গাঢ়তর। কেবলই শব্দ সাজিয়ে লেখককে সেখানে ভাষার সেই শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হয় যেখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যান না করেও পাঠক-চিত্তে উপলব্ধির আবহ-বলয় গড়ে উঠবে। এক একটি শব্দের ইঙ্গিত হবে সূক্ষ্ম অথচ সুনিপুণ — যাতে পাঠকের মনে বাচ্যার্থ ছাপিয়ে জাগে সেই ব্যঞ্জনা যেখানে প্রতিটি শব্দ ও বাক্য গিয়ে নাড়া দেয় মর্মতলের সঞ্চিত ভাবস্তরে। একেই বলে ভাষার ব্যঞ্জনা। ভাষার এই শক্তি-বলেই লীলাকমলের পাপড়ি গণনার বর্ণনায় কিশোরীর পূর্বরাগের লজ্জারুণতা বুঝিয়ে দেন কবি; 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা-র মুখের একটিমাত্র 'মরণ' শব্দে যে বিপুল আবেগতরঙ্গ উত্থিত হয় পাঠকচিত্তে তা শত ব্যাখ্যাতেও বোঝানো যায় না। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই' — এই বাক্যের কোনো বিকল্প হয় না। ছোটোগল্পে বিশেষ করে ভাষার বাহুল্যবর্জন ও গতিশীলতার প্রয়োজন হয়। সেখানে লেখকের বিবৃতি-ভাষার কুশলতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

বিভূতিভূষণের বিবৃতি-ভাষায় সর্বত্র কঠোর সংযম লক্ষ করা যায় না। কোনো কোনো গল্পের কেন্দ্রীয় অনুভব-বিন্দুটিতে যাবার পথে গ্রামের প্রকৃতি, মানুষজনের বর্ণনায় কখনো কখনো তাঁর কিছু দেরি হয়ে যায়। রুচির শোভনতা রক্ষার খাতিরেও মাঝে মাঝে শব্দ প্রয়োগের ঔচিত্য কিছু ব্যাহত হয়েছে — তা দেখেছি। কিন্তু খুবই কথঞ্চিৎ এক-ধরনের বিচ্যুতি। অপরপক্ষে আপাতভাবে কোনো চমক সৃষ্টি না করে যথোচিত শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগে বিভূতিভূষণ মাঝে মাঝেই আমাদের বিস্মিত করে দেন। মনে হয়, বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে যে খ্যাতি ও অমরত্ব পেয়েছেন তার মূলে ভাষাও কাজ করেছে অনেকখানি।

আমরা প্রবন্ধের শুরুতেই দেখিয়েছি যে, শব্দ সম্পর্কে তাঁর একটি গবেষকসুলভ আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহ ও কথাশিল্পীর প্রতিভার মিলনে তাঁর ভাষায় মাঝে মাঝেই অভাবিতপূর্ব ব্যঞ্জনা এসেছে। শব্দ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে শুরু করা যাক।

'বিপদ' গল্পের দরিদ্র, ক্ষুধার্ত বালিকার খাওয়ার বর্ণনায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন — '... হঠাৎ একদিন দেখি, রায়েদের বাহিরের ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি হাউ-হাউ করিয়া এক টুকরা তরমুজ খাইতেছে। যেভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে। 'হাউ হাউ' কথাটি সুষ্ঠুভাবে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঐ কথাটাই আমার মনে আসিল।'

'হাউ হাউ' শব্দের সঙ্গে একটি বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনার সংযোগ ঘটিয়েছেন লেখক এবং তা ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যেখানে ব্যাখ্যা না করেও শব্দের সঙ্গে অন্বিত বিশিষ্ট ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তিনি — সেখানেই তাঁকে বলব সার্থকতর।

মনে পড়ে 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পের কথা। শেয়ালদা লাইনে বাতের তেল বিক্রি করা ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল নিজের কাজ ও কর্মনৈপুণ্য নিয়ে গর্বিত। অপর এক বিক্রেতার সঙ্গে তার

তুলনা করা হলে সে বলে — 'তারা হল ফিরিওয়ালা — আমরা হলুম ক্যানভাসার —' এখানে দুটি শব্দেরই প্রয়োগে শ্রেণিভেদের স্পষ্টতার সঙ্গে বক্তার কণ্ঠের ও মনের গর্বটুকু চমৎকার ফুটে ওঠে।

'গায়ে হলুদ' গল্পে গ্রামীণ এক সম্পন্ন কৃষককে কলকাতা-ফেরত এক চাকুরিজীবী বলে — 'গোলাভর্তি ধান রেখেছেন ঘরে, আপনার মহড়া নেয় কে? কলকাতায় 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে এক সের চাল নিতে হচ্চে —' বক্তা চলে গেলে গৃহস্বামীর মেয়ে পুঁটি-র প্রশ্ন — 'কিসে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয় বাবা, বলছিল হরিকাকা?' পিতা বলেন — 'কে জানে কিসে দাঁড়িয়ে ...' কেবল 'কিউ' শব্দটির প্রয়োগে শুধু গ্রাম-শহরের প্রভেদ নয়, যুদ্ধের বাজারে কৃত্রিম অভাব-দীর্ণ কলকাতা-শহরের পূর্ণ বাতাবরণটি তুলে আনেন বিভূতিভূষণ।

এর আগে হিন্দি শব্দ এবং 'ডিপার্টমেন্ট' শব্দটির প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। একজন সমালোচক কথাসাহিত্যে শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে বলেছেন — শব্দের প্রয়োগের সঙ্গে স্মৃতির জাগরণ, সামাজিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সংলগ্নতার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াটি অবিচ্ছেদ্যভাবে ঘনিষ্ঠ। পাঠক প্রায়শই একটি শব্দের অর্থগ্রহণে একই কালে দুটি মনস্তত্ত্বগত স্তরে সক্রিয় থাকেন — 'Consciously, he receives a meaning from the denotation of the words; subconsciously, he receives a suggestion from their connotation.'(*Materials and Methods of Fiction*, Clayton Hamilton, New York, Garden City, 1964, P. 208)

বিভূতিভূষণের চিত্তে প্রকৃতির নির্মলতা, শুদ্ধতা, প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের প্রতি এক প্রগাঢ় প্রীতি ছিল তা সকলেই জানেন। নিসর্গের বিবরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত তাঁর সৌন্দর্য-রূপের অনুধ্যান, তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আত্মনিবেদন। এই ভাবটিকে ভাষায় ধরে দেবার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন তৎসম শব্দ। সংস্কৃত ভাষার প্রতি সাধারণ মানুষের সম্ভ্রম ও সে ভাষার পরিশীলিত কাব্যগুণ সম্পর্কে আস্থা থেকে হয়তো কিছুটা অসচেতনভাবেই ঘটেছে এ-জাতীয় প্রয়োগ।

শহরের বহু ভাড়াটের বাড়ি ছেড়ে গৃহস্থবধূ শ্যামলীর স্বামী গ্রামের দিকে বাগান-সহ গাছপালায় ঘেরা একটি সম্পূর্ণ বাড়ি কিনেছে। সেই পরিবেশে এসে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছে শ্যামলী — 'সেই ফুলের সুগন্ধ। তারা ভরা আকাশ। এই বাঁধা ঘাট, এই প্রাচীন বনস্পতি, এই বনপুষ্প সুবাস — সব তাদের নিজস্ব।' এখানে 'পুষ্প', 'সুবাস', 'বনস্পতি' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

যখনই বিভূতিভূষণ ভাষার বিন্যাসে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের নিবিড়তার সঙ্গে অ-লৌকিকতার মায়াময়তা মিশিয়ে এক কল্পভুবন গড়তে চান তখনই তাঁর ভাষায় মধুর নিষ্যন্দী ও রূপ-সমৃদ্ধ তৎসম শব্দের বিন্যাস লক্ষ করা যায়। তাঁর বিখ্যাত 'আরক' গল্পটিতে এই লিপিকুশলতাই প্রধান প্রকরণ।

এক বিচিত্র আরক সেবন করে গল্পের নায়ক রাজপুতানার এক নির্জন বনবেষ্টিত হ্রদের জলে রাজহংসীর মতো অপ্সরাদের দেখেছিলেন। সেই অলৌকিক সৌন্দর্য দেখে তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যান। সেই অপ্সরাদের রূপ বর্ণনায় দেখি নির্বাচিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ —

'কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতে বিস্মিত, ভীত-চকিত, দুঃসাহসী, আরক-সেবনকারী ঠাকুরদাদা দেখলেন, তারা সত্যিই হাঁস নয় — একদল অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে! ... ওরা সবাই জল

থেকে উঠলো এবং অল্প পরেই জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দিয়ে ভেসে হাঁসের মতই শুভ্র পাখা নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল — হ্রদের তীরের বাতাস তখনও তাদের অপূর্ব দেহগন্ধে ভরপুর।' তবে তৎসম শব্দ প্রয়োগ করলেও ভাষার অন্বয়গত সারল্যটি বিভূতিভূষণের ভাষা থেকে কখনোই হারায়নি। বিভূতি ভাষার এই সরল স্বচ্ছন্দ গতি তাঁর ভাষার অন্যতম বিশিষ্টতা।

ভাষার বস্তুরূপটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার প্রকরণ হিসেবে নাম-শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর *ফটিকচাঁদ* উপন্যাসে হারুন-কে দিয়ে বলিয়েছিলেন — তুমি যে বাড়ির ছেলে সে-সব বাড়ি থেকে ফটিকচন্দ্র নাম কবেই উঠে গেছে। নাম-শব্দের যথাযোগ্য স্থানে রাঢ়াবরণ ও আঞ্চলিকতার স্বাভাবিক রূপটি ফুটে ওঠে। এখানে তালিকা দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মনে না পড়ে পারে না অন্তত পনেরো রকম ধানের ও চালের নাম পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। আমন, আউশ খুবই চেনা নাম। বাঁশশলা, চামরমণি, বোগরা, বেনামুরি এমন আরও অনেক। কেবল গ্রামের নামগুলি দেখলেই বোঝা যায় কল্পনায় কেউ সে-সব নাম আনতে পারে না। সেগুলি সত্যিকারের বাংলার গ্রামের নাম। যেমন ঝিটকিপোতা, শাঁকমুড়ি, চাঁদুড়, সিজে-ডুমুর দ'।

ভাষার প্রাণ সঞ্চারিত হয় প্রবাদ-প্রবচন, ছড়ার প্রয়োগে। বাংলার গ্রামীণ নরনারীর মুখের কথায় প্রবাদ-প্রবচন-বাগ্‌ধারায় কথা সত্যিই কথাশিল্প হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণ রচিত সংলাপের ভাণ্ডারে অঙ্গুলি স্পর্শ করলেই উঠে আসে কোনো-না-কোনো প্রবচনের সজীব শব্দমালা। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া নিরর্থক কারণ তাতে তাঁর গল্পের ভাষার প্রবচন-প্রবাদের প্রকৃত সমৃদ্ধি অনুভব করা যাবে না।

আমরা বিভূতিভূষণের গল্প-ভাষার প্রচ্ছন্ন কিন্তু লক্ষ্যভেদী ব্যঞ্জনাগুণের কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করব। আগে বলেছি সারল্য তাঁর ভাষার প্রধান লক্ষণ এবং প্রধান শক্তিও। বক্রোক্তির চেয়ে আন্তরিকতা ও অনুভূতির সত্যতায় স্পন্দিত সরল বাচনেই তাঁর ভাষার মূল আকর্ষণ। অর্থাৎ শব্দ-সজ্জা নয় — সহমর্মিতার সত্যতা ও সততাই তাঁর ভাষার শৈল্পিকতা সম্ভব করে। তবু কোথাও কোথাও সতর্কভাবে তিনি বক্রোক্তি বাহিত ব্যঞ্জনায় আধুনিক পাঠককে আকৃষ্ট করেন।

হতদরিদ্র এক পরিবারে সম্পূর্ণ নিরক্ষর স্বামীর স্ত্রী কিছুদিন 'ইস্কুলি নেকাপড়া করেল' শুনে লেখক ও গল্পের বক্তা প্রশ্ন করেন '— কি ইস্কুল? বউটি ইহার উত্তর দিল। কারণ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পুরুষটির সাধ্যাতীত। অতি জটিল প্রশ্ন।' (অসাধারণ) বিন্যাসের কুশলতায় উদ্ধৃত অংশের শেষ বাক্যটি এক অসামান্য ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ বক্রোক্তি হয়ে ওঠে। সরল প্রশ্ন — কি ইস্কুল? কিন্তু নিরক্ষর গরিবের কাছে প্রশ্নটি 'অতি জটিল' কারণ তার প্রৌঢ় বয়সের পরিসরে বহুবিধ অভিজ্ঞতা থাকলেও 'ইস্কুল' নামক বস্তুটির কোনো অভিধাই নেই, ধারণাও নেই। 'ইস্কুল' বললে সে প্রায় কিছুই বুঝতে পারে না। স্কুলের নাম কিংবা অপর কোনো পরিচিতি থাকতে পারে — সে বিষয়েও সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

'ক্যান্‌ভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পে গোলাপী নামের এক দেহজীবিনীর কথা আছে যে কৃষ্ণলালের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে। পরস্পরের বিশ্বাসের বন্ধনে তারা বাঁধা। আর কোনো সম্বন্ধ না

থাকুক। — '... গোলাপীকে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়া তাহার মা একদিন নবীন কুণ্ডু লেনের মায়া কাটাইয়া বোধহয় উর্বশী বা তিলোত্তমা-লোকে প্রস্থান করিল।'

শেষ বাক্যটিতে আছে একটি ব্যঞ্জনাময় শ্লেষ। বিভূতিভূষণ পতিতা-পল্লির অধিবাসিনীদের কোনোদিন ঘৃণা করেননি। মন থেকেই তাদের ভালো ভেবেছেন তিনি। যে-সমাজ পতিতা-পল্লি সৃষ্টি করে, সেই পল্লিতে নিয়মিত নৈশযাত্রা অব্যাহত রাখে অথচ সেই পল্লিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে — সেই সমাজের প্রতিই মাঝে মাঝে বরং কটাক্ষ করেছেন তিনি। এখানে আছে তেমনই একটি আঘাত। সরসতার আবরণে ঢাকা কিন্তু অব্যর্থ। গোলাপী-র মা, যৌবনে সে নিজেও দেহজীবিনী ছিল — মৃত্যুর পর স্বর্গে গেছে বলতে গিয়ে ছদ্ম-সম্ভ্রমে থেমে গেছেন লেখক। পুণ্যবলে স্বর্গলাভ ঘটে। পতিতা নারীরা নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবার অধিকারিণী নয়। কিন্তু মানুষের কল্পনায় গড়া দেবলোকধাম সেই স্বর্গে উর্বশী-মেনকা-রম্ভা-তিলোত্তমারা তো থাকে! দেবভোগ্যা রূপজীবিনী ছাড়া আর কী-ই-বা তাদের পরিচয়! তাই 'উর্বশী বা তিলোত্তমা-লোক' বলে মৃত্যুলোকের তথা দেবপুরী স্বর্গের উল্লেখ করে লেখক মানুষের — বিশেষত পুরুষ-শাসিত সমাজের পাপ-পুণ্য ধারণার প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন তা আপাত সরস বলে উপভোগ্য হলেও লেখকের বিশ্লেষণী ও সমাজমনস্ক দৃষ্টিকোণের নির্ভুল অভিক্ষেপণ।

ওই গল্পেই কৃষ্ণলালের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বাস করবার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক — 'গ্রামে তাহার মন টেকে না। কখনও সে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রামে বাস করে নাই — এখানকার লোকে কথাবার্তা বলিতে জানে না, ভাল করিয়া মিশিতে জানে না, চা খায় না। কলিকাতায় রাস্তার ভিখারীও চা খায়।' শেষ বাক্যটি আমাদের আমূল চকিত করে দেয়। সত্যিই — গ্রামাঞ্চলে বিত্তশালী ব্যক্তিও চা খায় না। কিন্তু কলকাতার জীবন, নাগরিক জীবন আর চা যেন ওতপ্রোত জড়িত। 'কলিকাতায় রাস্তার ভিখারীও চা খায়' — এই অভিব্যক্তিতে কলকাতা শহরের শানিত, কঠিন, নিষ্ঠুর নাগরিকতা যেন রক্তের দাগ লাগা ছুরির মতো ঝকঝক করে ওঠে। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যে গ্রামজীবনের শ্রেষ্ঠ রূপকার বিভূতিভূষণের কলমে ক্যানভাসার কৃষ্ণলালের মতো এমন আদ্যন্ত একজন 'কলকাতার লোক' — এত সম্পূর্ণ একটি নাগরিক চরিত্র মূর্ত হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বিভূতিভূষণের এই গল্পটির থিম হল নাগরিকতা। 'আর্বানিটি'-র সঙ্গে আমরা সাধারণভাবে আর্থিক স্বাচ্ছল্যের, শিক্ষিত সংস্কৃতির একটি সংযোগ ভেবে নিয়ে থাকি। কিন্তু তেমন ভাবনা কি আবশ্যিক? শহরে অজস্র গরিব মানুষ থাকে; শহরে জীবনের সঙ্গে তাদের জীবিকার্জনের অবিচ্ছেদ্য সংযুক্তি। আর নগরবাসী বলেই নাগরিকতার মারী-প্রকোপও তারা এড়াতে পারে না — রাস্তার ভিখারীও চা খায়! এই অম্লমধুর নাগরিকতা শ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করেই কৃষ্ণলালের বেঁচে থাকা। ওই একটি ছত্রে কৃষ্ণলালের জীবনের সমগ্র আবহটি ঘনীভূত হয়েছে।

সবশেষে যে অংশের বাচিক ব্যঞ্জনার উদাহরণ দেব সেই থিমটি বিভূতিভূষণের লেখায় কমই প্রকট হয়ে ওঠে। নরনারী-সম্পর্কে প্রীতি-নিবিড়তার আমেজ মাঝে মাঝেই নিয়ে এলেও যৌন কামনার ইঙ্গিত তিনি ব্যবহার করেন কমই। *আরণ্যক* উপন্যাসে সত্যচরণ ও ভানুমতীর সম্পর্কে খুব সহজেই আতপ্ত কামনার সুর তোলা যেত, পরিবর্তে বিভূতিভূষণ আমাদের শুনিয়েছেন

স্নিগ্ধ বন্ধুত্বের সংলাপ। তার বেশি কিছু নয়। 'মুক্তি' গল্পে আখ্যানের দাবিতে নারী শরীর সম্পর্কে কামনার ব্যঞ্জনা তাঁকে আনতে হয়েছে — 'তুলসী দারোগা নদীর ঘাটের পথ ধরে নীলকুঠীর ওদিক থেকে ঘোড়া ক'রে ফিরবার সময়ে তুঁতবটের ছায়ায় প্রস্ফুট তুঁত ফুলের মাদকতাময় সুবাসের মধ্যে এই সিক্তবসনা গৌরাঙ্গী বধূকে ঘড়া কাঁখে যেতে দেখল। বসন্তের শেষ, ঈষৎ গরম পড়েচে — নতুবা তুঁত ফুল সুবাস ছড়াবে কেন?'

এই অংশটিতে দুটি বাক্য আছে। আসলে চারটি বাক্য। প্রথম দুটি বাক্য অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে এবং দ্বিতীয় বাক্য দুটি একটি অব্যয় শব্দ দ্বারা যুক্ত। এই চারটি বাক্যের প্রথমটি সাধারণ সংবাদ-সংবাহক। তুলসী দারোগা নদীর ঘাটের পথ ধরে নীল-কুঠির ওদিক থেকে ঘোড়ায় করে ফিরছিল। এই বাক্যটি পরবর্তী দৃশ্যের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। পরের বাক্যটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সংবাহক। প্রস্ফুট তুঁত ফুলের 'মাদকতাময় সুবাসের মধ্যে' 'সিক্তবসনা গৌরাঙ্গী বধূকে ঘড়া কাঁখে' যেতে দেখল। পুষ্পগন্ধ কাম-বিলাসের সহায়ক, নিসর্গলোকে মিলনসময়ের সূচক। 'মাদকতাময় সুবাস' শব্দবন্ধে পরিবেশের ইন্দ্রিয় ঘনতা ও তুলসী দারোগার উপস্থিতিকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'কলসী কাঁখে সিক্তবসনা সুন্দরী' বাংলা সাহিত্যের ও শিল্পকলার একটি বহু বহু ব্যবহৃত মোটিফ। মৃদু কামোদ্দীপক সৌন্দর্যের মূর্তি। বিভূতিভূষণ নারীরূপ বর্ণনায় সাধারণত কামোদ্দীপক ইঙ্গিত বা উপাদান ব্যবহার করেন না। বরং তাঁর ভাষায় নারীদেহ-বর্ণনা খানিকটা সচেতনভাবেই যেন মৃদুতম যৌন ইঙ্গিত বা কামজ আবহও বর্জন করে। সেই বিভূতিভূষণ এখানে 'সিক্তবসনা' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। 'জল নিয়ে যেতে দেখল' লিখতে পারতেন তিনি — অধিকাংশ সময়ে সেরকমই তিনি লেখেন। কিন্তু 'ঘড়া কাঁখে' লেখার মধ্যে নারী শরীরের বিশেষ ভঙ্গি, সিক্তবসন, ছল্‌কে ওঠা জল, পূর্ণ যৌবনা ক্ষীণমধ্যা নারীর শরীর ও পূর্ণ কলসের যে গড়ন সাদৃশ্য যুগে যুগে এই চিত্রটিকে একটি বিশেষ ভাবের নির্দিষ্ট 'রূপ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে — সেই বিশেষ ভাবটিই জাগাতে চেয়েছেন বিভূতিভূষণ। অন্য যে-কোনো লেখক নারীর কলসকক্ষ সিক্তবসন রূপের ছবি আঁকতেন অনেকটা অভ্যাসবশেই। সেরকম অভ্যাস একেবারেই ছিল না তাঁর। তাই তাঁর লেখনী নিঃসৃত 'সিক্তবসনা' ও 'ঘড়া কাঁখে' শব্দবন্ধ দুটিকে গুরুত্ব দিতে হয়। তুলসী দারোগা সেই বধূটিকে যেতে দেখল। তারপরেই বিভূতিভূষণ একটি নিসর্গ-বর্ণনায় চলে যান। 'বসন্তের শেষ, ঈষৎ গরম পড়েচে — নতুবা তুঁত ফুল সুবাস ছড়াবে কেন?' তুলসী দারোগার মনে কামলুব্ধতার ভাবনার জাগরণ এভাবেই বুঝিয়েছেন তিনি। শেষ বসন্ত, ঈষৎ গরম, ফুলের সুবাস — নিসর্গলোকে মিলনের কাল উপস্থিত। ভারতীয় সাহিত্যের আবহমানতায় বসন্তকাল ও রতিভাবের সহযোগ। জীবনানন্দ এই ভাবনাকেই প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায় — ইঙ্গিতটিকে আরও স্পষ্ট করে দিয়ে — 'শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে'। বিভূতিভূষণও যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন অনায়াসেই রতিভাবের উদ্‌গম প্রকাশ করতে পেরেছেন — ভাষার বিন্যাসে নিহিত ইঙ্গিতের সাহায্যে ও ভাষার প্রতীকী গুণ ব্যবহার করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য — এই 'মুক্তি' গল্পটিতেই আর এক যুবক এই সুন্দরী নারীকে নির্জন বনপথে ঘড়াসুদ্ধ পড়ে যেতে দেখে ছুটে এসে তাকে হাত ধরে উঠিয়েছিল এবং 'মা' বলে ডেকেছিল। সেই দৃশ্যের বিবরণে বিভূতিভূষণ 'সিক্তবসন' ও 'ঘড়া কাঁখে' অভিব্যক্তি দুটিকে বর্জন করেছিলেন।

এবং সেখানে বসন্ত-সমাগমও দেখাননি। লিখেছিলেন — 'সন্ধ্যার প্রাক্কালে, শীতকাল।' তিনি এই গল্পে ভাষ্য তথা ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে আগাগোড়া সচেতন ছিলেন — তা বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না আমাদের।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাক্যের নির্মাণ এবং পদের অন্বয়গুণ প্রধানত সরল। ক্রিয়াপদে তিনি কখনো সাধু, কখনো চলিত রূপ ব্যবহার করেছেন। তাতে ভাষার ধর্মের তেমন কিছু হেরফের ঘটেনি। তৎসম এবং তদ্ভব শব্দের সংখ্যাই তাঁর ভাষায় অধিক। দেশজ শব্দের ভাগ তুলনায় কম। প্রয়োজনে আরবি-ফারসি ও ইংরেজিও আছে। তৎসম শব্দের নির্বাচিত প্রয়োগে ভাষায় এক ধরনের সংহতি ও সংবেদগুণ আসে যা কেবলই চলতি শব্দের সাহায্যে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা সহজসাধ্য নয়। 'নিস্তারিণী শীর্ণ পাণ্ডুর দেহে উত্থানশক্তিরহিত শয্যাগত অবস্থায় শুধু 'খাই খাই' করে রোগের দুষ্টক্ষুধায় অবোধ বালিকার মত।' (মুক্তি) আবার চলিত শব্দের প্রয়োগেই যথাযথ হয়ে উঠেছে আর একটি গল্প — 'পাড়ার চারিধারে বনজঙ্গল, পিটুলি গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশঝাড়, বহু পুরনো আম-কাঁঠালের বাগান। ... সূর্যের আলো কস্মিন্‌কালে ঢোকে না, তার ওপর বাড়ীর সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটম্বুর, দিনরাত 'ষাঁওকো' 'ষাঁওকো' ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিনেরাতে মশার বিন্‌বিনুনি।' (দ্রবময়ীর কাশীবাস)

বিশেষণ, অব্যয়, বাগ্‌ধারা ঘেঁষা অভিব্যক্তি সবই ব্যবহার করেন বিভূতিভূষণ যথোচিত, কিন্তু তাঁর গল্পে কোনো মুদ্রাদোষ লক্ষ করা যায় না। সাধারণভাবে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও নদিয়ার ভাষা-বৈশিষ্ট্যই তাঁর লেখা গদ্যে পরিস্ফুট। তবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলার যে চলিত ভাষাটি শিষ্ট বাংলা গদ্যরূপে পরিচিত সেই কাঠামোর মধ্যেই তাঁর গল্পের ভাষার চলন। উপন্যাসে কখনো কাব্য-স্পন্দিত গদ্যাংশ রচনা করলেও গল্পে, যেখানে কোনো বাহুল্যের স্থান নেই, তিনি বাস্তবজীবনলগ্ন বাগ্‌ভঙ্গিটিই ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর গল্পের ভাষার ক্ষেত্রে তাতে সিদ্ধিই এসেছে। আসলে বিভূতিভূষণের গল্পের ভাষা পরিপূর্ণভাবে তাঁর গল্প-বিষয়ের সঙ্গে সংসক্ত। কোনো জায়গাতেই তাঁর ব্যবহৃত ভাষা তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় ও উপলব্ধিকে ছাপিয়ে যায়নি। সে-কারণেই কিছু কিছু আংশিক বিচ্যুতি সত্ত্বেও (যা আমরা প্রবন্ধের শুরুতে দেখিয়েছি) তাঁর ভাষার যাথার্থ্য ও গল্পের আভিপ্রায়িক ঐক্যের সঙ্গে (unity of impression) তার পূর্ণ সংযোগ তাঁকে নিজস্ব ও শিল্পসিদ্ধ এক রচনাশৈলীর অধিকারী করেছে। হার্বার্ট রিড সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সমালোচক। তাঁর সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যবিচার সর্বজনীন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি গদ্য রচনাশৈলী সম্পর্কে লিখেছেন — গদ্যরীতি লেখকের মনের একটি স্বাতন্ত্র্যকেই পরিস্ফুট করে (identity of the mind) : 'To give the phrase, the sentence, the entire composition ... a similar unity with its subjects. ...' (*English Prose style*, Indian Edition 1968, P. 10)। বিভূতিভূষণের গদ্যে এই ব্যাপারটি ঘটেছে বলেই তাঁর গদ্যশৈলী পাঠকচিত্ত জয় করেছে।